অমিত আহমেদ

ফেলে আসা গল্প যতো

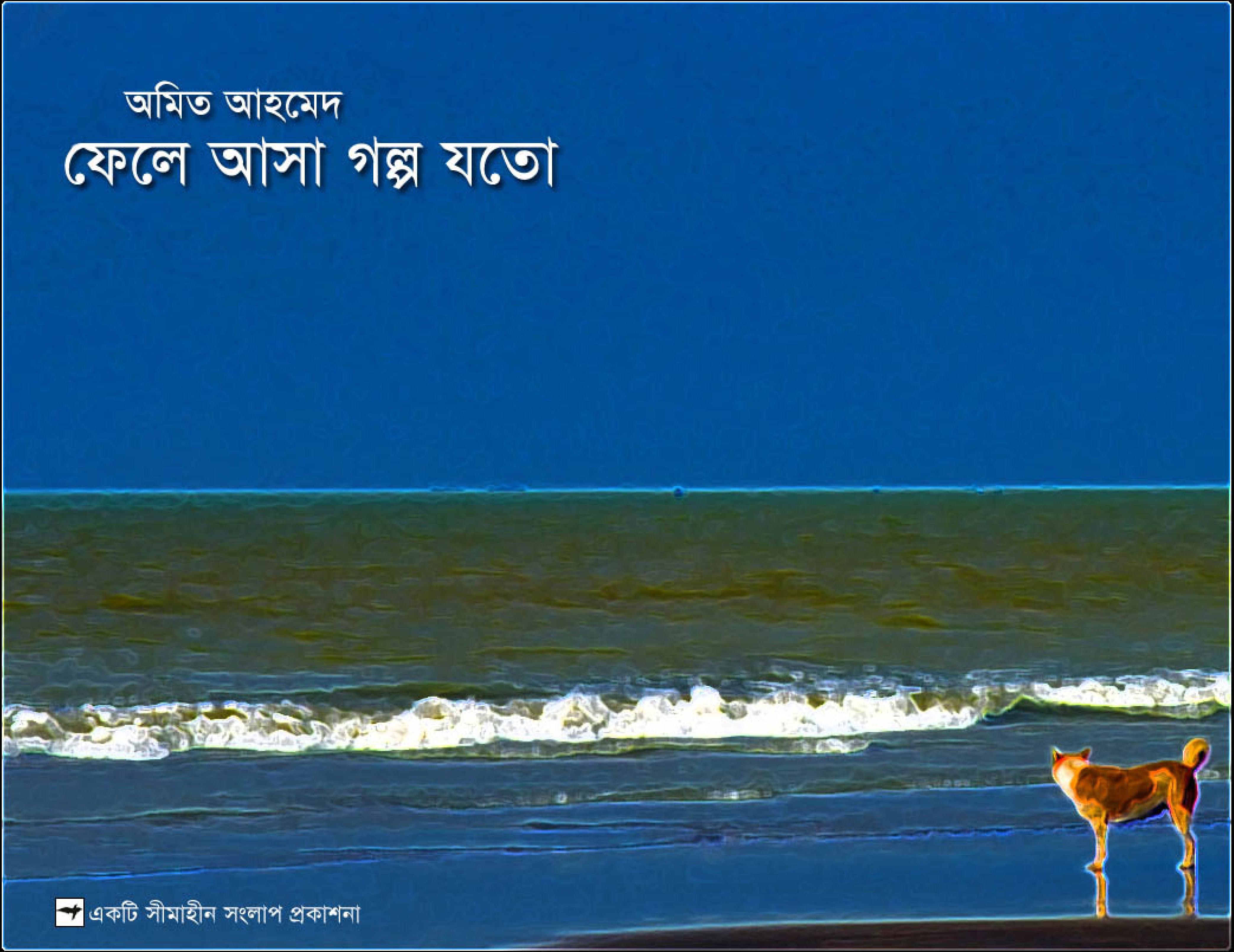

একটি সীমাহীন সংলাপ প্রকাশনা

অমিত আহমেদ

ফেলে আসা গল্প যতো

একটি সীমাহীন সংলাপ প্রকাশনা

অমিত আহমেদ
ফেলে আসা গল্প যতো

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০৯

প্রকাশক
সীমাহীন সংলাপ

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র
টিপু কিবরিয়া
tipukibria@gmail.com

অলংকরণ আলোকচিত্র
মাশীদ আহমেদ
masheed.ahmad@gmail.com

সর্বস্বত্ব
অমিত আহমেদ
aumit.ahmed@gmail.com

লেখকের অন্য বই
বৃষ্টিদিন রৌদ্রসময়, গল্পগ্রন্থ, শস্যপর্ব প্রকাশন
গন্দম, উপন্যাস, জাগৃতি প্রকাশন

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

“Fele Asha Golpo Joto” a collection of Aumit Ahmed’s Bengali short-stories; cover photography by Tipu Kibria; illustration photography by Masheed Ahmad; first Internet edition published on January 2009.

উৎসর্গ

খুব প্রিয় দুই মানুষ – তিথি ও তারেক।

প্রারম্ভিক

আমার ঘর-ছাড়া কিছু প্রিয় গল্প আছে। সেই গল্পগুলো কেনো জানি বারে বারে বাদ পড়ে যায়। আকারের দোষে; গভীরতা না থাকার অজুহাতে; কিংবা একদমই কাঠখোট্টা কোনো কারণে। কবে কোথায় কোন পত্রিকা, ব্লগে প্রকাশিত হয়েছিলো – সেভাবেই থেকে যায়। মাঝে মাঝে আমি নিজেই খুঁজে-পেতে পড়ি। আদরের চোখ বুলাই। “ফেলে আসা গল্প যতো” এমনই কিছু গল্পের সংকলন।

অমিত আহমেদ

সূচিপত্র

পড়ন্ত বেলার জনৈক জুয়াড়ি	৬
প্রভাবক	৯
গ্যাপ	১২
খাদ্য	১৪
শাশুড়ি সংক্রান্ত সংঘাতত্রয়...	১৬
সমানুপাতিক	১৮
যখন বৃষ্টি নামে	২০
আহারে!	২২
যদি	২৪
ফ্যান্টাসি	২৬
বিভ্রাট	২৮

গল্পের নামের উপর ক্লিক করে সরাসরি গল্পে যান।
গল্প লেখার সময়কালে ক্লিক করে আবার এই পেজে ফিরে আসুন।

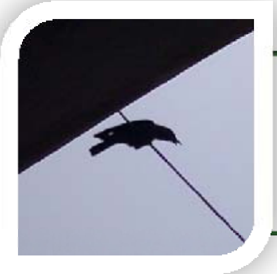

পড়ন্ত বেলার জনৈক জুয়াড়ি

নিজের সাথে নিজে বাজি ধরেন কখনো? আমি কিন্তু ধরি। জ্বী, নিজের সাথেই। এটা আমার একটা খেলা বলতে পারেন। কিংবা সময় কাটাবার অবলম্বন। বুঝতে পারলেন না তো? এই ধরুন পার্কে বসে কারো জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনি হয়তো একাকিত্ব কাটাবার জন্য ফস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে ফেলবেন; ব্যাগ থেকে বের করবেন অর্ধেক পড়া কোনো গল্পের বই; কিংবা পকেট থেকে হাল মডেলের মোবাইল ফোন। আমার আবার এগুলো নিষেধ আছে। বয়স হয়েছে তো – শরীরে নানান অসুখ বাসা বেঁধেছে। ডাক্তারের নির্দেশে সিগারেট ছাড়তে হলো। চোখের অবস্থাও ভালো নয়। আর এসব যন্ত্রপাতির ব্যাপার, বুঝলেন না, আমার মাথায় আবার ঠিক ঢোকে না! তাই সময় কাটাবার জন্য নিজের সাথেই বাজি ধরি।

খুব উত্তেজক কিছু যে হতে হবে তা নয়। এই যেমন ধরুন সামনে বৈদ্যুতিক তারে একটা শালিক বসে আছে। আমি বাজি ধরবো এক থেকে দশ গোনার মধ্যে শালিকটা উড়ে যাবে। যদি উড়ে যায় তবে আমার জিত হলো, না গেলে হার। বাজির শর্ত থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই, তবে থাকলে উত্তেজনা একটু বাড়ে বৈকি! আমার শর্তগুলোও নেহায়তই সাধারণ ধরণের। উদাহরণ দিলেই বুঝবেন। এই ধরুন শর্ত দিলাম – আজ যদি বেশিরভাগ বাজিতে হারি তবে রাতে ভাত খাবো শুধু করল্লা ভাজি দিয়ে। করল্লা সবজিটি, বুঝলেন, আমার গিন্নীর যতোই প্রিয় হোক, আমার আবার ঠিক রোচে না!

পার্কে বসে ফয়জুরের জন্য অপেক্ষা করছি। আমরা একই সরকারী অফিসে কাজ করতাম। রিটায়ারও প্রায় একই সাথে করেছি। বিকেল বেলায় দুই বুড়োতে মিলে পাড়ার পার্কে বসে টুকটাক গল্প করি। ফয়জুরের ডায়াবেটিসের প্রভাব আছে বলে ডাক্তার প্রতিদিন একটু করে হাঁটতে বলেছে। ওর সাথে আমারো হাঁটা হয়ে যায়। পার্কটার রক্ষণাবেক্ষণ বেশ ভালো, দারোয়ান আছে, শান্ত নিরবচ্ছিন্ন পরিবেশ। আমাদের তাই বেশ লাগে।

আজ একটু আগে সবে বেঞ্চে এসে বসেছি – পার্কের বাঁধানো সরু রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে "থুক" করে একদলা কফ ফেলে গেলেন জনৈক ভদ্রলোক। নিজে নেহায়তই ভদ্র বলে "ভদ্রলোক" বলছি। তা না হলে যেই কাজ উনি করলেন, আর যাই হোক ভদ্রলোক উনাকে বলা যায় না! আমার মেজাজ যে গরম হয়নি তা বলবো না। আরে ব্যাটা কফ-থুতু ফেলবি ভালো কথা, চারপাশে এত্ত খোলা জায়গা আছে, সেখানে ফেল! ঠিক বেঞ্চের কাছেই কেনো ফেলতে হবে? ফয়জুর থাকলে এতক্ষণে এই নিয়ে তুলকালাম করে ফেলত। ফয়জুর দেখতে যেমন গাঁট্টা-গোট্টা তেমনি ওর মাথাও, বুঝলেন না, একটু গরম। একটুতেই চিল্লা-পাল্লা করে। আমি চাপা মানুষ, ঝামেলা এড়িয়ে চলি। তাই ব্যাপারটা দেখেও না দেখার ভান করে চুপচাপ বসে থাকলাম।

জিনিসটা দেখতে খুব শোভন নয়। কেমন যেনো গা গুলিয়ে আসে! থকথকে, একটু হলুদাভ। আঠার মতো ত্যাকত্যাকে। দেখতে না চাইলেও নজর ওই দিকে চলে যাচ্ছে দেখে ভাবলাম আজ না হয় এ নিয়েই বাজি ধরা যাক। পার্ক ছেড়ে যাবার আগে পিন্ডটা কেউ মাড়িয়ে গেলে আমার জিত হবে, না গেলে হার!

বাজির শর্তও ঠিক করে ফেলি। আজ পাকাবাজারে আমাদের লুচি-বুন্দিয়া খেতে যাবার কথা। ডায়াবেটিস হবার পর থেকেই খেয়াল করেছি ফয়জুরের মিষ্টান্নের ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ জন্মেছে। কোন বাজারের কালোজাম ভালো, কিংবা কোন বাজারের রসমালাই – তার সব মহাশয়ের মুখস্থ থাকে। আজ লুচি-বুন্দিয়ার পরিকল্পনাটাও তার। যদি আমার হার হয় তবে আজকের পুরো বিল না হয় আমিই ভরবো। ঠিক আছে তো?

যে কোনো বাজি ধরার পরেই আমার কেমন যেনো উত্তেজনা হয়। রক্তে বেশ চনমনে ভাব চলে আসে। বয়স একধাপে বিশ বছর কমে যায়।

বাজি ধরতে না ধরতেই কমবয়সী এক মেয়ে থুতুপিন্ডের ঠিক পাশ দিয়ে হেঁটে চলে যায়! আর মাত্র দুই ইঞ্চি, বুঝলেন, মাত্র দু' ইঞ্চি হলেই আর দেখতে হতো না! আজকালকার মেয়েদের কাপড়-চোপড়ের হাল দেখলে নিজেরই শরম লাগে! বয়স কম হলে কী হবে, বুঝলেন, মেয়েটির বক্ষ আবার বেশ উন্নত। তার উপর আবার ছোট্ট টাইট গেঞ্জি পড়েছে। নাভি-টাভি সবই দেখা যায়! জ্বী? না আমি আবার কী করলাম! এভাবে খুলে রাখলে, মানে, চোখ তো একটু যাবেই, বুঝলেন না? আচ্ছা বাদ দেন এইসব কথা!

এরপরে যায় সাইকেল চড়ে এক ছেলে। বেয়াদ্দপটা এমন ভাবে সাইকেল চালাচ্ছে যেনো ওটা সাইকেল নয়, এরোপ্লেন! রাস্তায় বয়স্ক মানুষজন থাকতে পারেন, বাচ্চা-কাচ্চা থাকতে পারে – সেদিকে তো একটু খেয়াল রাখতে হবে না কী? সেও দেখি সাইকেল পিন্ডের খুব কাছ দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যায়। কফে চাকা ফেলে না। সাইকেলে চড়ে কফ মাড়িয়ে গেলেও তো সেটাকে আমার বিজয় হিসেবেই ধরে নেয়া যেতো, না?

এরপরে আসেন বাচ্চাসহ এক মহিলা। মহিলার দেহ, ব্বাপরে বাপ, হাতিও লজ্জা পাবে! নিশ্চিত ছিলাম বাজি এবারে জিতেই যাচ্ছি। হস্তিশাবক যেভাবে রাস্তা জুড়ে লাফালাফি করছে শিকার ওরই হবার কথা ছিলো। আর সে বাদ গেলেও ওর হস্তিনী মা'র প্রকান্ড পা থেকে নিশ্চই পিন্ডটা রেহাই পাবে না। কিন্তু আমাকে হতাশ করে দিয়ে ওরা দু'জনেই নির্ঝঞ্ঝাটে রাস্তা পেরিয়ে গেলো।

এরপর আসেন পাইপ মুখে সুবেশী এক ভদ্রলোক। প্রায় আমার বয়সী। সাথে আবার বিদেশী কুকুর! ভাব, বুঝলেন না? এগুলো ভাব! চোরাকারবার করে টাকা কামিয়ে কুকুর নিয়ে পার্কে মকশো করতে আসেন। জ্বী না, আমি কিভাবে চিনবো? তবে এ বোঝার জন্য কি আর চিন-পরিচয় লাগে বলেন? দেখলেই বোঝা যায়। কুত্তাওয়ালাও বেহায়ার মতো সুট করে সাইড দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পিন্ডে পা দিলেন না।

আমার বেশ অধৈর্য লাগে। এরপরে রাস্তা একদম ফাঁকা, কাছে-পিঠে কেউ নেই। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে। যে কোনো সময় ফয়জুর চলে আসবে। আর এসেই বাজারে যাবার জন্য হুড়ো-হুড়ি শুরু করে দেবে। পার্কের নিরাপত্তার উপরে এখন একটু রাগই লাগে আমার। এত কড়া পাহারা না থাকলে অন্তত্য শসাওয়ালা-মুড়িওয়ালাদের ভিড় থাকতো। রিটায়ার করার পর টাকা নিয়ে একটু টানা-টানিতেই থাকি। হিসেব করে চলতে হয়। ছেলে-মেয়ের কাছে চাইতেও কেমন যেনো লজ্জা লজ্জা লাগে। এর মাঝে দুম করে বাজিতে হেরে লুচি-বুন্দিয়ার ভার নেয়াটা কোনো কাজের কথা নয়! তবে এটা এড়ানোর একটা দুই-নম্বরী বুদ্ধি আছে, হে

হে! যা করতে হবে তা হলো – আরেকটা বাজি ধরতে হবে। সেই বাজিতে জিতে গেলে আজকের বিল আর আমি দেবো না। আর যদি হেরে যাই, আল্লা না করুক, আগামী দিনের বিলও আমি ভরবো।

কেমন যেনো একটা শব্দ আসে কানে। শব্দ সন্ধানে পাশে তাকাতেই পেয়ে যাই নতুন বাজির বিষয়। পাশের বেঞ্চে সিমেন্টের হাতলের ওপরে কে যেনো একটা প্রানকোলার মোচড়ানো টিনের বোতল রেখে গেছে। বোতলটা পুরো খালি নয় নিশ্চই। খালি হলে যে পরিমান বাতাস দিচ্ছে এতক্ষণে ঠিক পড়ে যেতো। সামান্য পানীয় ভেতরে আছে বলেই কোনো মতে টিকে আছে। বাতাস এলেই প্রবল ভাবে দোল খাচ্ছে আর সিমেন্টের সাথে টোকা খেয়ে কেমন টক্-টক্ আওয়াজ করছে। বাজি ধরা যাক, পার্ক ছাড়ার আগেই বোতলটা পড়ে যাবে।

বাজি ধরে বেশ আরাম লাগে। এটাতে জিতে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। বেশ ভালো বাতাস দিচ্ছে। বোতলটা হাতলের একদম কিনারে সেঁটে আছে, আরেকটু জোরে বাতাস দিলেই নির্ঘাত পড়ে যাবে। আর টাইমিং দেখেন। বাজি ঠিক হতে না হতেই দেখি ফয়জুর দূর থেকে হাত ইশারা দিচ্ছে! আমি দেখেও না দেখার ভান করে বসে থাকি। ফয়জুরের পায়ের তলে কফপিন্ড পড়লেও আমি জিতে যাচ্ছি। ওই না হয় আসুক এদিকে। বুদ্ধি কাজে দেয়। দেখি বড় বড় পা ফেলে আসছে ফয়জুর। এদিকে বাতাসের জোরও বাড়ছে। সে এক উত্তেজনাময় মুহূর্তরে ভাই। আমি টান-টান বসে থাকি। বলেন দেখি, এই উত্তেজনা আপনি আপনার গল্পের বইয়ে পাবেন? পাবেন মোবাইল ফোনে? ইম্পসিবল!

তবে দিনটা যে কুফা তা বেশ বোঝা যায়। ফয়জুর ব্যাটা থুতুপিন্ডের ঠিক কোনা দিয়ে ঠিক-ঠিক বেরিয়ে আসে। মন হতাশায় ভরে যায়, দু' টো বাজিতেই হেরেছি! কাছে এসে একগাল হাসে ফয়জুর। মহা আনন্দ নিয়ে বলে, "আজকের প্ল্যান মনে আছে তো?"

পরাজিতের মতো উঠে দাঁড়াই আমি। এক কদম সামনে বেড়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে খ্যাক করে বলি, "কিসের প্ল্যান?"

বাঁধভাঙা আনন্দে পান খাওয়া লাল দাঁতগুলো বের করে দেয় ফয়জুর। পিঠে দড়াম এক কিল মেরে বলে, "আর্-রে! লুচি... হা হা হা... বুন্দিয়া! মনে নাই?"

দেখতে সাদামাটা হলে কী হবে, ফয়জুরের শক্তি আছে! এই দিকে আমি নেহায়তই শুকনো-পাতলা একহারা মানুষ। পিঠে ওর বল্গাহারা চাপড় খেয়ে টলমল দুলে যাই। তাল সামলাতে আঁকা-বাঁকা নড়বড়ে পায়ে হেঁটে যাই দুই কদম। নিচে না তাকিয়েই বুঝতে পারি আমার ডান পা গিয়ে পড়েছে সেই থ্যাকথ্যাকে পিচ্ছিল জিনিসটির উপরে। স্যান্ডেল ভেদ করেও ঘিনঘিনে জিনিসটার অবস্থান বেশ ভালোই বুঝতে পারি। আরো বুঝতে পারি হড়কে যাচ্ছি আমি। মনে হয়, প্রথম বাজিতে জিতে গেলাম। ইচ্ছে করে যখন পা ফেলিনি জিত তো আমারই হলো, নাকি?

ভাবতে ভাবতেই আমার ডান পা কফে পিছলে যেনো যাদুবলে বাতাসে উড়ে যায়। ছোট্ট বলের মতো পাশের বেঞ্চে ছিটকে পড়ি আমি। সিমেন্টের শক্ত গাঁথুনিতে খট্ মাথা করে মাথা ঠুকে যায়। আর ঠুকে যাওয়া মাথায় পাকা ফলের মতো টুক করে খসে পড়ে আধ খাওয়া প্রানকোলার মোচাড়ানো বোতল।

হেহ! আর আমি কিনা ভাবছিলাম আজ দিনটা কুফা!

আগস্ট ২০০৮

প্রভাবক

গ্রেহাউন্ডের আন্তঃনগর বাস থেকে নেমেই নান্টুর মনে হলো বিশাল একটা ভুল হয়ে গেছে! ভুলের মাত্রা এত বেশি যে নান্টুর মাথা দপ্‌ করে ধরে ওঠে। মনে হয় ফুসফুসে মোটেই অক্সিজেন যাচ্ছে না। এড্রানালিনের অতিরিক্ত ক্ষরণে এমনই হয় ওর। হঠাৎ চোখে অন্ধকার দেখে। মাথার ভেতরে চিন্তাগুলো কেমন এলোমেলো হয়ে যায়। সিগারেটের নিকোটিন আর কফির ক্যাফেইনই এই সময়ের একমাত্র মহৌষধ।

বাসের সামনে থেকে সরে গিয়ে অন্যদের নামার জায়গা করে দেয় নান্টু। পকেট হাতড়ে কাঁপা-কাঁপা হাতে সিগারেট বের করে। এখন দরকার এক কাপ কড়া কফি। আশেপাশে তাকিয়ে দু' টো হটডগ ভেন্ডর ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। এক লাফে রাস্তার জমে থাকা বরফ-গলা পানি পেরিয়ে ডানডাস স্ট্রিটের দিকে হাঁটা শুরু করে নান্টু। ডানডাসে পৌঁছে ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে উঠলেই রায়ার্সন বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে টিম হর্টনস থাকার কথা। উত্তর আমেরিকা কিভাবে মানুষকে ব্রান্ডনির্ভর করে তোলে হাঁটতে হাঁটতে তাই ভাবে নান্টু। বাসস্টপের বে স্ট্রিট থেকে টিম হর্টনসের ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট প্রায় পনেরো-বিশ মিনিটের হাঁটা পথ। এর মাঝে বেশ কয়েকটা ছোট-বড় কফি হাউস আছে। অথচ সে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে সেই টিম হর্টনসেই যাবে বলে ঠিক করে ফেলেছে!

সিগারেটে দমকা টান দিয়ে চিন্তা লাইনে আনার চেষ্টা করে নান্টু। এত বড় ভুল কিভাবে হলো আর এখন কী করণীয় তা হিসেব করা যাক।

এই কয়দিন আগে পরিবেশবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রী পেয়েছে। সমাবর্তনের আগেই চাকরীর খোঁজ করা এখানে রেয়াজ। নান্টুও তাই করেছিলো। ভাগ্য ভালো বলতে হবে। আবেদনের সাথে সাথেই ফোন আসে একটা বড় বহুজাতিক কোম্পানি থেকে। টেলিফোনে সাক্ষাতকার চমৎকার হলো। কম্পানি জানিয়ে দিলো, "চাকরী তোমার এক রকম হয়েই গেছে। এখন বাকি কেবল আনুষ্ঠানিকতা। আগামী সোমবারে কাগজপত্র নিয়ে চলে এসো। মুখোমুখি সাক্ষাতকার হবে। আমরা আমাদের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করবো। তুমিও তোমার চুক্তি সাক্ষর করার আগে একবার চোখ বুলিয়ে নেবে!"

এই ধরণের সাক্ষাতে দুই-তিনজনকে সব সময় আলাদা করে রাখা হয়। অনেক সময় অনেকে নানা কারণে সম্মুখ সাক্ষাতে আসতে পারেন না। আবার অনেক সময় দেখা যায় আবেদনকারী আবেদনপত্রে যা দাবি করেছিলেন তা কাগজপত্রে দেখাতে পারছেন না। সেসব ক্ষেত্রে জমা থেকে টান পড়ে।

আজ সেই সম্মুখ সাক্ষাতের সোমবার। অফিসে কাগজপত্র নিয়ে দেখা করার কথা। বাস থেকে নেমে ওর মনে পড়েছে কাগজপত্রের লাল ফাইলটা সাথে করে আনা হয়নি!

দোষ যদি কাউকে দিতে হয় তবে সেটা নাজমুল ভাইকে দিতে হবে। অক্লান্ত পরিশ্রম শেষে তিনি অবশেষে এই বার তার চার বছরের ডিগ্রী সাত বছরে শেষ করেছেন। আর তাই তার আনন্দও অন্যদের তুলনায় বেশি।

গতকাল রাতে তিনি বাঙালি বন্ধুদের জন্য পার্টি রেখেছিলেন। সেখানে অফুরন্ত ভোজ্যের সাথে পানীয়েরও ব্যবস্থা ছিলো। নান্টু অনেক মিনতি করেও তার পানের অনুরোধ ফেরাতে পারেনি। নজমুল ভাই যখন গাড়িতে করে বাসায় নামিয়ে দিলেন তখন প্রায় ভোর চারটা বাজে। বাসায় এসে ওর সব সময় আগামীদিনের জন্য ব্যাগ গুছিয়ে রাখা অভ্যাস। কিন্তু গতকাল ক্লান্তি আর নেশার ঘোরে মনে হয় না সেটা করা হয়েছিলো। আজ সকালে অভ্যাসবশে ও ব্যাগ কাঁধে নিয়েই বেরিয়ে পড়েছে। বেরুবার আগে একবার ব্যাগ খুলে দেখারও প্রয়োজন বোধ করেনি।

টিম হর্টনসে ঢুকে একটা বড় কালো কফি নিয়ে বাইরের সিমেন্টের চত্বরে এসে বসে নান্টু। এখন বাজে সকাল এগারো। আর আধা ঘন্টা বাদে দেখা করার কথা। ও থাকে পিটারব্রো। টরন্টো থেকে বাসে প্রায় দেড় ঘন্টা লাগে। এর মাঝে ফিরে গিয়ে কাগজ নিয়ে আসার প্রশ্নই আসে না।

বাসের কথা মনে হতেই মন বিষিয়ে ওঠে ওর। চাকরি তো হাতছাড়া হলোই মাঝখান দিয়ে বাস ভাড়ার ত্রিশ ডলারো গচ্চা। এই ত্রিশ ডলারে চমৎকার দু' বেলা নাস্তা করা যেতো! আচ্ছা, এখন ও যদি অফিসে গিয়ে বলে এমন ঘটনা ঘটে গেছে তাহলে কী হবে? সম্ভবত ওরা ভাববে এই অপগন্ডকে চাকরি না দেয়াই উত্তম!

আরেকটা কাজ অবশ্য করা যায়। যদিও সেটা কিছুটা অনৈতিক হয়ে যাবে। ফোন করে বলা যায়, "ড্রাইভ করে টরন্টো যাবার পথে ওর গাড়ি পিছলে পাশের নালায় পড়ে গেছে!" বরফ গলার এই সময়ে এটা একটা দৈনন্দিন ঘটনা। ওর যে গাড়ি নেই সেটা তো আর ওদের জানা নেই। এখানে মানুষ আবহাওয়া সংক্রান্ত সমস্যা সব সময় বিশেষ বিবেচনা করে। ফলে মিথ্যেটা কাজে লাগলেও লাগতে পারে!

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল নান্টু – তাই করবে। আর হতচ্ছাড়া চাকরি না পেলেই বা কী? একবার ইন্টারভিউ দিয়ে যখন ডাক পেয়েছে তখন অন্য জায়গা থেকেও নিশ্চই পাবে! ক্যাফেইন আর নিকোটিনের মিশ্র কেরামতিতে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসছে বুঝতে পেরে সিগারেটে আরেকটা দমকা টান দেয় নান্টু।

"খুচরা পয়সা হবে কিছু? ভাংতি পয়সা?" ভাঙা শ্লেমা জড়ানো গলায় ঘোর ভাঙে নান্টুর। ওর পাশে কখন যেনো একটা ভবঘুরে এসে বসেছে খেয়ালই করেনি ও। বুড়ো। মুখে না কাটা ময়লা দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। গায়ে তেল চিটচিটে লম্বা ওভারকোট। পায়ে বিচিত্র লাল রঙের জুতো। নান্টু তাকাতেই হাতে ধরে রাখা কাগজের কাপ ঝাঁকায় লোকটা। ঝুনঝুন শব্দে বোঝা যায় বেশ কয়েকটা পয়সা ইতিমধ্যেই তার উপার্জন হয়েছে।

করুণা নিয়ে ভবঘুরেকে যাচাই করে নান্টু। একদম হতভাগ্য মানুষ ছাড়া এখানে কপর্দকশূন্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। অনেকে অবশ্য ইচ্ছে করেই সব ছেড়ে-ছুড়ে রাস্তায় নেমে আসে। ওরা বলে এটা তাদের ঘূণ ধরা-নিয়মে বাঁধা সমাজের বিরুদ্ধে নিরব প্রতিবাদ!

পকেট হাতড়ে কয়েকটা কোয়ার্টার বের করে লোকটার কাপে ফেলে দিয়ে নিজের চিন্তায় ফেরে নান্টু। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে যে কাল রাতে নেশার ঘোরে লাল ফাইলটা সে ঠিকই ব্যাগে ঢুকিয়েছিলো। পরে আর মনে নেই। হতে পারে না? নিশ্চই পারে! এখন ব্যাগ খুলে দেখলেই তা পরিস্কার হয়ে যাবে।

"নেই!"

চমকে পাশে তাকায় নান্টু। বুড়ো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। "কি বললেন?"

দাড়ি-গোঁফের ফাঁকে লাল দাঁত বের হাসে বুড়ো। বলে, "যা খুঁজছো তা পাবে না!"

বোকা বনে যায় নান্টু। বলে, "কী খুঁজছি?"

উত্তর না দিয়ে চোখ টেপে বুড়ো। "অদৃষ্ট বলে একটা জিনিস আছে জানো তো? আমাদের নিয়ে খেলা করাতেই সেই হতভাগার আমোদ! তার হাত থেকে ছাড়া পাওয়ার কোনো উপায় নেই। জন্ম থেকেই তার থিকথিকে জালে আমরা আটকে গেছি। এই যে এখন তুমি আর আমি মিলে এখানে গল্প করছি। এটা কি হবার কথা ছিলো বলো? কোথায় থাকার কথা ছিলো এখন তোমার?" এমন ভাবে রহস্যমাখা গলায় কথাগুলো বলে বুড়ো যেনো সে সব আগে থেকে জেনে বসে আছে।

"আমি আগে কি করতাম জানো?"

উত্তর না দিয়ে ফাঁকা চোখে তাকিয়ে থাকে নান্টু। উত্তরের অবশ্য আশাও করে না বুড়ো। বলে চলে, "ওই যে ওই অফিস। ওখানে প্রতিদিন স্যুট পরে হাজিরা দিতাম! বিশ্বাস হয়?"

হাত তুলে যেদিক দেখায় বুড়ো সেদিকে প্রায় কয়েকশো অফিস আছে। "..কিন্তু শেষমেষ লাভ কী হলো শুনি? অদৃষ্ট আমাকে টেনে এই রাস্তায় তো ঠিকই নামিয়েছে... নাকি?"

ঘ্যাশ ঘ্যাশ করে নোংরা দাড়ি চুলকে নান্টুর কাঁধে হাত রাখে বুড়ো, "অন্ধের মতো দৌড়ানো বন্ধ করো হে। বাসায় যাও। গিয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করো কোন পথে নিচ্ছে তোমাকে তোমার অদৃষ্ট। যদি বুঝে ফেলতে পারো তবে সেই মতো পথ চলাতেই সাফল্য। এছাড়া সবই লবডঙ্কা!"

নান্টু বুঝতে পারে কোনো এক বিচিত্র কারণে বুড়োর কথাগুলো ওর মাথায় পাকা ঢুকে যাচ্ছে। "সেটা কিভাবে বুঝবো?"

"হা হা...", প্রশ্রয়ের হাসি হাসে বুড়ো, "সবই ইশারায় হয় বুঝলে ছোকরা। সেই ইশারার মানে বুঝতে হয়।"

হুট করে উঠে দাঁড়ায় ভবঘুরে। নান্টুর হাতে এক টুকরো মোড়ানো কাগজ দিয়ে বলে, "বাসায় গিয়ে খুলবে। দেখবে ইশারা বোঝা কতো সহজ হয়ে গেছে তোমার জন্য!" দাঁতের ফাঁক দিয়ে পিচিক করে থুতু ফেলে ভিড়ে মিলিয়ে যায়।

বাসায় এসেই কাগজের টুকরো খোলে নান্টু। কয়েকটা হিজিবিজি সংখ্যা সাজানো। সংখ্যাগুলো সম্পূর্ণ ভাবেই অবিন্যস্ত মনে হচ্ছে। এগুলো কিভাবে অদৃষ্টের ইশারা বুঝতে সাহায্য করবে কিছুতেই বুঝে পায় না নান্টু।

কাগজটা দলা করে ছুঁড়ে ফেলে অজান্তে ব্যাগ খুলেই শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে যায় নান্টুর।

সেখানে টুকিটাকি অনেক জিনিসের ফাঁকে শুয়ে আছে ওর নিরিহ দর্শণ লাল ফাইলটা।

মার্চ ২০০৭

গ্যাপ

গতকাল থেকেই খুব উত্তেজনায় আছেন জামান সাহেব। মন বসাতে পারছেন না কোনো কাজে। অথচ বছরের এই সময়ে অফিসে কাজের চাপ খুব বেড়ে যায়। সোনালী সময়। তবু মন বসছে না। স্মৃতিকাতরতায় ভুগছেন তিনি। কলেজ জীবনের কথা মনে পড়ছে।

ঝন্টু তানজিন ইজু তানভীর সবুজ এরা সবাই কে কোথায় আছে কে জানে! যোগাযোগ নেই বলে এতদিন শুধুই আফসোস করে এসেছেন। এখন সময় এসেছে সেই আফসোস মেটানোর। এতগুলো দিন পরে, বিশ বছর পরে পুনর্মিলন হচ্ছে কলেজে।

গতকালই ছাপানো আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন । পাঠানো হয়েছে অনেক আগেই। তবে ডাকবিভাগের বদৌলতে হাতে এসেছে মাত্র গতকাল। চিঠি পেয়ে রক্ত ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিলো জামান সাহেবের। আর যদি চব্বিশ ঘন্টা পরে আসতো? তবে? পুরানো বন্ধুদের সঙ্গ হারাতেন তিনি!

সকাল আটটার সময় যেতে বলেছে। প্রথম দু' ঘন্টা আলোচনা। এরপরে মূল অনুষ্ঠান ও দুপুরের খাবার। এরপরে বন্ধুদের আড্ডা। ১৯৭৮ ব্যাচের আড্ডা হবে ২০১ নম্বর কামরায়। কামরার নম্বর লক্ষ্য করে বুক ছ্যাঁত করে ওঠে জামান সাহেবের। ২০১ নম্বর কামরা! এই কামরাতেই তো কেটেছে তার দু' টো বছর। এই কামরা ঘিরেই তো বসতো জম্পেস আড্ডা। রেসুরো কোরাসে জমাট গান হতো। পেন ফাইট কিংবা বিতর্ক!

আচ্ছা সবুজ ইজু ওরা সবাই চিঠি পেয়েছে তো? আসবে তো সবাই? এসব চিন্তাতেই হু-হু সময় চলে যায়।

ঘড়ি দেখে কী মনে করে যেনো লাল শার্টটা বের করেন জামান সাহেব। তার ছোট শালা গত জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলো। এমন রঙ-চঙা শার্ট পরার যে আর বয়স নেই সেটা আর খেয়াল করেনি কান্ডজ্ঞানহীণ ছেলেটা।

শার্ট পরতে পরতে আপন মনেই হাসেন জামান সাহেব। এই নিয়ে নির্ঘাত খুব হাসাহাসি হবে আজ। তানভীর বলবে, "আগুন জ্বালায়া দিছস দেখি? শার্টটা কি নতুন নামাইলি?" মনে মনে কি সেই চান না তিনি? হাসি হবে ঠাট্টা হবে। সারাদিন কেটে যাবে অহেতুক আড্ডাতে।

গাড়িতে উঠে অফিসের নাম্বার টেপেন জামান সাহেব। "হ্যাঁ মিলি। শোনো আমি একটা ব্যক্তিগত কাজে আটকা পড়েছি। মিটিংয়ে আমি থাকতে পারবো না। ..না। তুমি রুস্তমকে বলো আমার জায়গায় যেতে। ঠিক আছে? আমার হয়ে রুস্তমকে ক্ষমা চেয়ে নিতে বলো।"

গাড়ি থেকে নেমে একটু থমকে দাঁড়ান জামান সাহেব। কলেজ অনেক বদলে গেছে। আগে দো' তলা ছিলো। এখন চারতলা হয়েছে। রঙ বদলেছে। আশে-পাশে নতুন অনেক গাছ লাগানো হয়েছে। বেশ সুন্দর লাগছে দেখতে।

আলোচনা শেষে দ্রুত পা চালান তিনি। ২০১ নম্বর কামরার সামনে এসে কেমন থমকে যান। ভুল কামরায় চলে এলেন না তো? এত নিশ্চুপ কেনো সব! হইচই আর আড্ডার সেই গমগমে আওয়াজ কই? না কি কেউ

আসেনি এখনো? ভেতরে ঢুকে আরও চমকে যান জামান সাহেব। সবাই-ই তো এসেছে!

তাকে দেখেই হাসিমুখে একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসেন। বলেন, "আপনি নিশ্চই জামান?"

"আপনি"! "আপনি" করে বলছে তানজিন! কেমন যেনো অসহায় লাগে জামান সাহেবের।

"জ্বী! আর আপনি নিশ্চই তানজিন?" বলেই চমকে যান! অজান্তে নিজেও আপনি করে বলে ফেলেছেন তানজিনকে।

সবার সাথেই আবার নতুন করে পরিচিত হতে হয়।

খুব বড় দাগা খেয়ে যান জামান সাহেব।

কোথায় সেই চিৎকার ঠাট্টা হাসি আর আড্ডামুখর পরিবেশ? ওই যে ওই ভদ্রলোক ক্রমাগত ব্যবসার কথা বলছেন। তিনি কি ইজু? যে কথা বলতো কম? আর ওই যে চুপচাপ এক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন? ঝন্টু? যার মুখ দিয়ে গালি ছাড়া কথাই বেরুতো না? মোবাইলে ব্যস্ত টাকমাথা ভদ্রলোকটা কি সবুজ? কৌতুকের ভান্ডার তানজিন আর রাজনীতি কপচানো এই ভদ্রলোক কি সেই একই লোক? আর অকালে বুড়ো হয়ে যাওয়া ওই লোকটিই কি সদাহাস্যময় তানভীর?

রাগে-দুঃখে চিৎকার করতে ইচ্ছে হয় জামান সাহেবের, "কিরে শালা, তোদের সব কী হলো?" সংকোচে পারেন না। বরং ক্লান্ত হাতে মোবাইল বের করেন। অফিসে জানাতে হবে মিটিংয়ে তিনি যাচ্ছেন।

লাল টকটকে শার্টটা মিটিংয়ে তাকে অস্বস্তিতে ফেলে দেবে ঠিক। তবে উপায় নেই। তিনি বুঝে গেছেন আড্ডা আর জমবে না।

ঠিক আছে। সবই ঠিক আছে। কেবল মাঝখান থেকে চলে গেছে বিশটা বছর!

জানুয়ারি ২০০০

খাদ্য

“তুমি কি নিশ্চিত সুর্ক? প্রানীগুলো সম্পর্কে তুমি অন্য যা বলেছো তা ঠিক আছে। কিন্তু এই কথাটা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়।” অবিশ্বাস ভরা গলায় বলেন প্রার্ক।

“অবশ্যই নিশ্চিত মহামান্য প্রার্ক! ” উত্তেজনায় নীলাভ হয়ে এসেছে সুর্কের সবুজাভ দেহ।

“আমাদের যৌথ মানসিক তরঙ্গের মাধ্যমে মহাকাশযানটার মূল কম্পিউটার তরঙ্গ আমি ধরতে পেরেছি। সেখানে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষণ করা আছে। এই প্রানীগুলো শক্তি সংগ্রহে দূর্বল প্রানীদেহ ভক্ষণ করে।”

প্রার্ক বুঝতে পারলেন তার দেহ অধিক বিস্ময়ে তিরতিরিয়ে কাঁপছে, “এ কী করে সম্ভব সুর্ক? তোমার নিশ্চই কোনো ভুল হয়েছে। কোনো প্রানী কখনোই শক্তি সংগ্রহে অন্য প্রানীদেহ ভক্ষণ করতে পারে না। এটা সম্ভব নয়।”

“আমার কোনো ভুল হয়নি মহামান্য পার্ক। আমি আমার তথ্য তিনবার মিলিয়ে দেখেছি। শুধু অন্য প্রানী নয় এরা স্বজাতীকেও হত্যা করে। সে কাজের সুবিধার্থে এরা প্রচুর যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। এদের প্রানীজগৎ সম্পূর্ণ অন্য ভাবে গড়ে উঠেছে। এরা মোটেই আমাদের মতো নয় মহামান্য – জন্মগত ভাবেই এরা ধ্বংসাত্মক! ”

জোরে শ্বাস টেনে উপস্থিত সবার দিকে তাকান প্রা। অধিকাংশের দেহ নীলাভ হয়ে উঠেছে। অল্প- বিস্তর কাঁপছে সবাই।

পার্ককে নিরব দেখে বলে যায় সুর্ক, “..এরা সাধারণত দূর্বল প্রানীকে হত্যা করে তাদের মৃতদেহ আগুনে ঝলসিয়ে মুখের ভেতরে থাকা ধাঁরালো হাড় দিয়ে পিষে...”

“চুপ করো সুর্ক! দয়া করে চুপ করো!” চেঁচিয়ে ওঠেন প্রার্ক। জোরে শ্বাস টেনে বলেন, “একটাই উপায় আছে এখন। দেরি হয়ে যাবার আগেই আগেই আমরা সবাই মিলে এদের মহাকাশযানের কাছে গিয়ে আমাদের সম্মিলিত মানসিক তরঙ্গ প্রয়োগে যানের মূল কম্পিউটারের নির্দেশ প্রতিক্রম করতে পারি – যেনো মহাকাশযানটা নিজে থেকেই আমাদের গ্রহ থেকে চলে যায়। আর সেই সাথে ওদের তথ্যভান্ডার থেকে এ গ্রহ সম্পর্কিত সব তথ্য মুছে ফেলতে হবে – যেনো ওরা গ্রহটাকে আর খুঁজে না পায়।”

“সেটা আমরা কখন করবো মহামান্য প্রার্ক?”

“এক্ষুনি! ইতিমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আর নয়। আমাদেরকে এক্ষুনি যেতে হবে।”

***

“জর্জ, রাডারে নিরিহ প্রানের যে অস্তিত্ব ধরা পড়েছিলো তা কাছে আসছে! স্ক্রিনের ফোঁটাগুলো দেখেছো? একটা ফোঁটা মানে একটা প্রান।

সংখ্যায় খুব বেশি নয়। মাত্র ছাপ্পানোটার মতো।” রাডারবোর্ডে ঝুঁকে বলে মঈন।

“পুরো গ্রহে মাত্র ছাপান্নোটা জটিল প্রান? এতো চরম ফালতু আর রসকষহীন গ্রহ! দেখি ওদেরকে ফোকাস করে স্ক্রিনে নিয়ে আসো তো। চেহারা কেমন দেখি।” কফির মগে চুমুক দিয়ে নির্লিপ্ত ভাবে বলে জর্জ।

ক্যাপ্টেনের কথা মতো একটা বোতাম ঘোরায় মঈন।

“খাইছে! এ যে দেখতে একদম মুরগির মতো। রঙ কেবল সবুজাভ।” বিস্ময়ে হা হয়ে যায় সুন্দরী সোনালী চুলের নেভিগেটর সুজানা।

কফি কাপ টেবিলে রেখে উত্তেজনায় স্ক্রিনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জর্জ, “মঈন লাইফকম কাজ করার মতো দূরত্বে এসেছে ওরা?”

ক্যাপ্টেনের উত্তেজনা মঈনের মাঝেও সংক্রামিত হয়, কাঁপা কাঁপা গলায় বলে, “ইয়েস ক্যাপ্টেন! লাইফকম ইতিমধ্যেই চালু করেছি...”, বলে চলে মঈন, “কম্পিউটার বলছে ওদের বুদ্ধিমত্তা প্রায় শূন্য। দৈহিক গঠন মুরগির কাছাকাছি। জৈবিক প্রক্রিয়া অন্য রকম। সবুজাভ দেহ লক্ষ্য করেছো? ওটা দেহে থাকা ক্লোরোফিলের জন্য! কম্পিউটার সন্দেহ করছে এরা মিউটেট হওয়া মুরগিরই কোনো প্রজাতি। আলট্রামিউটেশন!”

“মাই গড!” শিউরে ওঠে জর্জ, “দেখো তো এদের মাংস খাওয়া যাবে নাকি?”

“যাবে!” বলে মঈন, “কম্পিউটার বলছে ওদের মাংস সুস্বাদু। স্বাস্থ্যমানও ভালো... প্রানীজ-উদ্ভিজ দুই ধরণের প্রটিনই আছে!”

“প্রিয় ক্রু সকল!” গলা চড়ায় জর্জ, “রে গানগুলো বের করো। আর রাধুনী রোবটগুলোকে তৈরি হোতে বলো। অনেকদিন সিনথেটিক খাবার খেয়েছি, আর নয়! আজ ভোজ হবে। মোরগ-পোলাও!”

ক্যাপ্টেনের ঘোষণা শুনে আনন্দ হই-হই করে ওঠে কন্ট্রোরুম ভর্তি মানুষগুলো।

আগস্ট ১৯৯৯

শাশুড়ি সংক্রান্ত সংঘাতত্রয়...

পাপিয়াকে নিতে ওর আম্মা আসেন। মহারাগী মহিলা। দেখলেই শীত শীত লাগে। এদিকে আমার অবস্থা কাহিল। হৃদয় পাকাপাকি ভাবে পাপিয়ার ব্যাগে আশ্রয় নিয়েছে। অবসর সময় কাটে আর্চিস গ্যালারি আর হলমার্কসে।

আমার ব্যাগে পাপিয়ার জন্য কেনা কমপক্ষে পনেরোটা ছোট-খাট গিফট আছে। কিন্তু দেবার সুযোগ নেই। আম্মা। ওর আম্মাই মেইন প্রবলেম!

এই বিপদে আমার সঙ্গী রাজু। ব্যাটা পদে পদে উপদেশ মতামত আর বুদ্ধি দিয়ে আমার অবস্থা আরো শোচনীয় করে তুলেছে।

প্রাইভেট ক্লাস শেষে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। পাপিয়া এখনো বের হয়নি। ওর আম্মা আসেননি এখনো।

“কুল ডাউন, কুল ডাউন ম্যান!” সবগুলো দাঁত বের করে হাসে রাজু। হাতে বাংলা ফাইভ ধরে রেখেছে।

“সিগারেট খাবো না।” গম্ভীর ভাবে বললাম।

“খা ব্যাটা। নিকোটিন তোর মাথা ঠান্ডা করবে। এই যে ছাগলের বাচ্চার মতো ছটফট করছিস এটা কমবে।”

নিলাম সিগারেট। নতুন ধরেছি। দু’ টো টান দিতেই কাশির দমকে চোখে পানি চলে আসলো।

“আস্তে টান ব্যাটা। পেপসির স্ট্র নাকি এটা যে দমকা টান দিচ্ছিস? আস্তে আস্তে টান দে। খালাম্মাকে দেখলে ফেলে দিবি।”

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। তৃতীয় টান দিয়ে মুখ তুলেছি। দেখি পাপিয়ার আম্মা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। চোখমুখ লাল করে আমার দিকেই তাকিয়ে আছেন। আমার হার্টবিট মিস হলো একটা। মুখে ধোঁয়া নিয়ে সালাম দেয়া ঠিক হবে কিনা তাই ভাবছি এমন সময় মুখ থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে গেলো।

কিভাবে বেরুলো কেনো বেরুলো এগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করা বৃথা। শুধু দেখলাম ধোঁয়া তীরের মতো ছুটে গেলো ভদ্রমহিলার মুখের দিকে। আমি সিগারেট হাতে নিয়েই ওই স্থান থেকে কাট মারলাম।

দ্বিতীয় ঘটনা নিউমার্কেটের সামনে। চার-পাঁচজন দোস্ত মিলে আড্ডা মারছি। একসাথে অনেকজন থাকলে যা হয়। সবাই মিলে লাথালাথি-গুঁতোগুঁতি চলছে। এমন সময় রাজু ঠাস করে আমার গালে চড় বসিয়ে দিলো। আমার দোষ আমি দু’ মিনিট আগে আমি ওকে লাথি মেরেছিলাম। ব্যাস। দিলাম গালির ছিপি খুলে।

ওর এবং ওর বিভিন্ন আত্মীয়ার সঙ্গে আমার কী ধরণের সম্পর্ক তা গালির মাধ্যমে প্রকাশ করে প্রায় ক্লাসিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছি এমন সময় সামনে পাপিয়ার আম্মা উপস্থিত হলেন। সেই একই ভঙ্গি। একই দৃষ্টি। আমি গালি বর্ষণ থামিয়ে দু’ টো ঢোক গিললাম। আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে স্থান ত্যাগ করলেন তিনি।

তৃতীয় ঘটনা ঘটলো পাপিয়ার কলেজের সামনে। রাজুর বুদ্ধি অনুযায়ী পাপিয়াদের টিফিন টাইমে হেভী মাঞ্জা মেরে গিয়েছি। যদি পাপিয়াকে এক নজর দেখা যায়।

এমন সময় আবার খালাম্মা।

এবার আর ভুল নয়। আর মুখোমুখি পড়ছি না! পেছন ফিরে দিলাম ছুট – রাস্তা বরাবর। ফলাফল রিক্সার সাথে সংঘর্ষ এবং অন্ধকার।

চোখ মেলে দেখি ভেজা রুমাল দিয়ে আমার কপাল ভিজিয়ে দিচ্ছেন খালাম্মা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজলাম আবার।

কী মুসিবতে পড়লাম! ফাজিল রাজুকে সামনে পেলে হয়!

জুলাই ১৯৯৯

সমানুপাতিক

ছোট ছেলেটাকে ঘিরে কান্নার মাতম খুব বেশি করে কানে বাজে রমিজ মিয়ার। পিন্টুর মা আছড়ে-পিছড়ে কাঁদছে। চারপাশে ঘিরে বসা গ্রামের মুরুব্বি মহিলারা সবাই। বাদ আছর জানাজা হবে।

ডুমুর গাছে হেলান দিয়ে দুই হাঁটু ধরে বসে আছে রমিজ মিয়া। দৃষ্টি সোজা সাদা কাপড়ে মোড়ানো দেহটার দিকে। নিজের ছেলের লাশের দিকে তাকিয়ে দুঃখের বদলে রাগে গা জ্বালা করে ওঠে রমিজের। হাজার বার মানা করা হয়েছে নদীর পাশের বটগাছে উঠতে।

গাছের শেকড় প্রমত্তা পদ্মাকে বাঁধা দেবার দুঃসাহস দেখিয়ে নদীতে ঘূর্ণি তৈরি করেছে। গাছের ডালগুলো ঝুঁকে গিয়ে পড়েছে ঠিক সেই ঘূর্ণির ওপরে। আর সেখানেই সব খেলা ছেলের। এই ঘূর্ণিতে পড়লে মানুষ বাঁচে?

"মৌলবিসাব আছরের আগে আইসতে পাইরবে না। ওইদিকে পাগলাডারেও মাটি দেওন লাইগবে।" ব্যাপারী পাশে দাঁড়িয়ে বলে। ভ্রু কুঁচকে রেখেছে। ছেলেকে চোখের সামনে মরতে দেখেছে রমিজ মিয়া। দেখেছে ব্যাপারীও। কিন্তু বাপের মমতার কাছে কোথায় কী? ছেলেকে মরতে দেখার পরে একবারো কাঁদেনি রমিজ মিয়া। এটাই ব্যাপারীর ভ্রু কোঁচকানোর কারণ। কান্না পুষে রাখা মানে বড় ঝড়ের আলামত।

কথা ঘোরায় ব্যাপারী, "মনা পাগলার কারবারডা দেইখলা? ওই ঘূর্ণিতে ঝাঁপ মাইরলো? পিন্টুরে বাঁচাইতে তো পারলোই না নিজেও ডুইব্যে মইরলো। পাগলার নাই জানের ডর..."

রমিজের কালো ঠোঁটের কোনে হাসি দেখে থমকে যায় ব্যাপারী। কথায় কথায় কী বলে ফেলেছে ধরতে পেরে রক্ত ঠান্ডা হয়ে আসে। রমিজ মিয়ার হাসি বুকে কাঁপ ধরিয়ে দেয় ব্যাপারীর।

"দেহি ওইদিকে কী খবর..., " পা চালিয়ে পালিয়ে বাঁচে ব্যাপারী।

পাগলার নাই জানের ডর! হাসির কথা।

একদিনের কথা মনে পড়ে যায় রমিজের। হাট থেকে ফিরছিলো। দেখে নদীর ধারে জটলা। কাছে গিয়ে রহস্য বোঝা গেলো। চোরাপাঁকে দশ টাকার একটা নোট পড়ে আছে। জানা গেলো মনা পাগলার টাকা। কিভাবে পেয়েছে কে জানে। সেই টাকা উড়ে গিয়ে পড়েছে চোরাপাঁকের ঠিক মাঝখানে। সেটাই হাস্যরসের কারণ।

পিক ফেলে হাসে মন্তাজ আলি, "যাও মনা। তুইলা আনো টাকাডা। টাকা হইলো আল্লার রিজিক। ওইডা নষ্ট করা ভালো না।"

দশ টাকা মনার জন্য বিশাল ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো আগ্রহ দেখায় না মনা পাগলা। গুম হয়ে বসে থাকে পাঁকের পাশে। সবার সাথে রমিজও প্রান খুলে হেসেছিলো সেই দিন। এটুকু বোঝার ক্ষমতা আছে পাগলার। ওখানে নামা মানে ওপারে চলে যাওয়া।

"পাগলার নাই জানের ডর।" হা হা হা। হাসিটা আস্তে আস্তে শক্তিধর হতে থাকে। মহিলারা বিস্ময় চেপে ফিস ফিস করে, "দুঃখে বাপে পাগল হইলো বুঝি।" কথা কানে যেতে থমকে যায় রমিজ। বিড়বিড়িয়ে বলে, "পাগল যাইবে, পাগল আইসবে।"

ছেলেবেলা থেকেই পাগল মনা। সেই তখন থেকেই বাচ্চারা খেপিয়ে এসেছে মনাকে। রাস্তায় দেখলেই সুর করে ছড়া কাটতো। ঢিল ছুঁড়তো। মনা কিন্তু একদমই গায়ে মাখতো না এসব। বন্ধুত্ব করতে চাইতো ওদের সাথেই। বয়স বাড়লেও ওই একই চেষ্টা মনার – ছোটদের সাথে বন্ধুত্ব। বাবুই এর বাসা কিংবা পিপড়ের ডিম, কোনোটা সংগ্রহেই আপত্তি নেই মনার। তাই সেই চেষ্টা সব সময় বিফলেও যায়নি।

পিন্টুকে মনার সাথেই ঘুরতে দেখেছে রমিজ। একসাথে ছুটেছে। সাঁতার কেটেছে। খেলেছে। রমিজ বকেছে শাসন করেছে। কিন্তু লাভ হয়নি কোনো।

"পাগলাডারে পোলাপাইন চান্দা তুইলে মাটি দিতেছে হুইনলাম?" প্রশ্ন আসে মন্তাজ আলির কাছ থেকে। রক্ত লাল চোখে তাকায় রমিজ। ব্যাপারীর মতোই চমকে ওঠে মন্তাজ। কথা বাড়ায় না। সরে যায় গাছতলা থেকে।

ঘটনা স্পষ্ট চোখে ভাসে রমিজ মিয়ার। বিড়ি টানতে টানতে গল্প করছে সে ব্যাপারীর সাথে, আমজাদের দোকানে। গাছের ডালে উঠে বসেছে পিন্টু। দু' বার চিৎকার করে নামতে বলে আবার গল্পে ডুবে গেছে রমিজ। সামনের হাটে স্টার যাত্রার প্যান্ডেল বসবে। সেই নিয়ে রসালো আলাপের কমতি নেই।

মনা পাগলা গাছতলে দাঁড়িয়ে হাত তুলে ডাকছে পিন্টুকে। এমন সময় রব উঠলো, "গেলো গেলো। ডুইব্যে গেলো!"

বিড়ি ফেলে তীরে ছুটে যায় রমিজ মিয়া। কাঁছা বাঁধতে গিয়েও থমকে যায়। মৃত্যু! সামনে সটান দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু!

ঝপাস!

শব্দে ঘোর ভাঙে রমিজ মিয়ার। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মনা পাগলা। রমিজের মতো সামনে মৃত্যুকে দেখেনি পাগলে।

সবকিছু ছেড়েছুড়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ একটা দেহের ওপর কেন্দ্রীভূত হয়। ঝুঁকে পড়া কাঁধ নিয়ে ডুকরে ওঠে রমিজ মিয়া।

মনা পাগল মরেছে ঠিক। সেই সাথে মেরে দিয়ে গেছে তাকেও!

জুন ২০০০

যখন বৃষ্টি নামে

সিন্ডি "গালা"-র সামনে বারে বারে কেনো "গ্র্যান্ড" বসাচ্ছিলো তা রহমান বিল্লাহ অনুষ্ঠানে এসে বুঝতে পারেন। মেয়ের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট ফার্ম তুলকালাম কান্ড করেছে! এত চটকদার অনুষ্ঠানে আসার সুযোগ রহমান বিল্লাহর আগে কখনো হয়নি।

শহরের অন্য প্রান্তে উপশহরের সীমানা জুড়ে প্রকান্ড দালান। রানীর সম্পত্তি ছিলো। পাউন্ডের দাম পড়ে যাবার পর রাজপরিবার অনেক প্রাসাদ বিক্রি করে দিয়েছে, কিংবা ভাড়া দিয়েছে। এই প্রাসাদটা তেমনই একটা। ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরী। অসাধারণ স্থাপত্য। মার্বেলের মেঝে, পেতলের কারুকাজ, কাঠের নৈপুন্য, সাদা খিলান আর প্রকান্ড থাম। মাথার ওপরে আর পাশের দেয়ালে নাম জানা না জানা শিল্পীদের আঁকা পৌরাণিক চিত্রকল্প। ছাঁদের কোনা থেকে উঁকি মেরে থাকা গারগয়েল। সুবিশাল জানালা জুড়ে ভারী মখমলের পর্দা।

এত সুন্দর দালানের আলাদা সজ্জার প্রয়োজন পড়ে না। বুদ্ধিমতী সিন্ডি সে চেষ্টাও করেনি। প্রাসাদের অলংকরণ যেমন ছিলো ঠিক তেমনি রেখেছে। কেবল আলোকসজ্জা আর শিফন দিয়ে পুরো বলরুমকে আরও মায়াময় করে তুলেছে। হঠাৎ ঢুকে ধাক্কা খেতে হয়। মনে হয় অন্য কোনো কল্পরাজ্যে ঢুকে পড়লাম বুঝি। আঁধারীতে ছিটিয়ে থাকা সাদা-কালো টক্সিডো লাল বো-টাই আর ঝলমলে নারী-পোষাক। নাচের জায়গা ঘিরে খাবারের স্তূপে প্রকান্ড টানা-টানা কাঠের টেবিল। তার চার পাশজুড়ে জাদুকর, জিপসী গণক আর স্বল্পবসনা পরিবেশীকার দল। টুং-টাং শব্দে শ্যাম্পেনের গ্লাস। চাপা গলার হাসি।

রহমান বিল্লাহর হুট করে ক্ষুধা পায়। ডিনারের বেল বাজেনি – এখন চাইলেও খাওয়া যাবে না। তিনি আস্তে আস্তে খাবারের টেবিলের দিকে সরে আসেন। এখন টুক করে একটা স্প্রিংরোল তুলে নিলে কেউ কি লক্ষ্য করবে? রহমান বিল্লাহর নিজেকে কেমন অসহায় মনে হয়। বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে। সেই ছোটবেলার কথা। তখন প্রেক্ষাপট অন্য ছিলো। স্বল্প আয়ে তার বাবা দুইবেলা পাতে খাবার তুলে দিতে পারতেন না। দুপুরে মা বেরুতেন কলমী শাকের সন্ধানে। আজ নিজেকে, এত খাবারের সামনে, কেমন অচ্ছুত মনে হয়। মনে হয় এই ঘরে তার উপস্থিতি একটা নিছক দুর্ঘটনা মাত্র। কিংবা খুব অশ্লীল কিছু। রহমান বিল্লাহ আড়চোখে চারদিকে তাকিয়ে একটা টেবিল থেকে একটা ডাম্পলিং তুলে মুখে পুরে দেন। ভেতরে কী দেয়া? পর্ক না তো?

সবাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গল্প করছে। টুক করে কোনো দলে ঢুকে গেলে কেমন হয়? বড় মানুষদের বড় আলোচনা। গলফ কিংবা নতুন কেনা কোনো কান্ট্রিহাউসের আলাপ। তেলের দর কিংবা পাউন্ডের পতন। রহমান বিল্লাহ পাকা বাঙালির মতো চারপাশে বাদামী চামড়ার মানুষের খোঁজ করেন। জাজ ফার্গুসনের নতুন সেক্রেটারি মায়া বাদে আর কাউকেই নজরে পড়ে না। মায়া জাজের সাথে একদম সেঁটে আছে। জাজ ফার্গুসনের পক্ষাঘাতগ্রস্থ বউয়ের নাম যেনো কী? নাটালি? নাকি নাটালিয়া? আচ্ছা

মায়া মেয়েটির গল্প কী? কোন দেশের? ভারত? নাকি বাঙালি? কখনো জানা হয়নি।

রহমান বিল্লাহর হঠাৎ খুব বাঙলা বলতে ইচ্ছে করে। এখন যদি তিনি হেঁটে গিয়ে মায়াকে বলেন, "এক কাপ চা খাওয়াতে পারবে মায়া?" তাহলে কেমন হয়? ঠিক দেশের মতো কড়া লিকার, ঘন-দুধ আর বেশি চিনি দেয়া চা। ঠিক যেমনটা কোনো বিশেষ দিনে কালো গাইয়ের দুধ নিয়ে মা বানাতেন।

বিল্লাহ আরেকটা ডাম্পলিং তুলে মুখে দিতে দিতে ধরা পড়ে যান। ডাচেস ফ্রিডা ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে আছেন। রহমান সাহেবের লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে হয়। ডাচেস তার পাশে দাঁড়ানো এমপি রায়ার্সনকে কী যেনো বলেন। বাদামী মানুষের হাভাতে আচরণ নিয়েই কী? রহমান বিল্লাহর জমা করে রাখা সব আত্মবিশ্বাস পেজা তুষারের মতো ঝরে ঝরে পড়ে।

এই চটকের মেলা তো তার জন্য নয়। কেনো জোর করে মানিয়ে নেবার চেষ্টা? কিসের এই দায়বদ্ধতা? একটা ছোট টিনের ঘর। বাম পাশের পুকুর ছুঁয়ে আসা ভেজা বাতাস। সামনে ধানের ক্ষেতে বয়ে যাওয়া সবুজ স্রোত। দেয়ালে চেনা টিকটিকির টিক-টিক। সামনের উঠোনে শুকাতে দেয়া ধান। আর এক পাশে তাকিয়া পেতে মুঠো ভরে মুড়ি-গুড়। হয়তোবা একগ্লাস গরম দুধ। কিংবা হয়তো ঠান্ডা খেজুরের রস।

রহমান বিল্লাহর কল্পনায় আঁধার নেমে আসে। সব আলো বিলীন হয়ে ঝলমল করে ওঠে বলরুমের মাথায় গড়া ছিমছাম পাটাতন। মাইক্রোফোন হাতে স্টেজে উঠে আসে বিলেতের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে। হাতের রেডওয়াইন নাচিয়ে মজা মজা স্বরে বলে, "নাহ। রেকর্ড মুনাফার পার্টি এটা নয়। এটা পৃথিবীর ষষ্ঠতম ধনীর ছবি ফোর্বসে আসার আনন্দ-উৎসব..." বলরুমে হাসির রোল ওঠে। রহমান সাহেবের পাশে কে যেনো দাঁড়ায়। মায়া! বলে, "দুর্দান্ত পার্টি!"

রহমান বিল্লাহ কী বলবেন তা বুঝে ওঠার আগেই বলরুমে তালির ঝড় ওঠে। এত মানুষের তালিতে কেমন যেনো বিভ্রম জন্মে। মনে হয় এ যেনো টিনের চালে হঠাৎ নামা ঝুম বৃষ্টির আওয়াজ। মায়ার বুক থেকে উঠে আসা ঘ্রানকে মনে হয় মাটির মিষ্টি সোঁদা ভাঁপ। সেই ভাঁপে তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তিনি মোহাবিষ্ঠের মতো হাঁটতে শুরু করেন।

স্টেজের সিড়ির ধাপ ভাঙতে ভাঙতে সব কেমন যেনো পরিস্কার হয়ে যায়। বৃষ্টির ছাঁট হয়ে যায় ছিটিয়ে দেয়া গোলাপের পাঁপড়ি। বৃষ্টির আওয়াজ ধনী মানুষের উচ্ছাস। আর ঠুনকো আত্মগ্লানী হয়ে ওঠে আত্মবিশ্বাসী প্রগল্ভতা। নুয়ে থাকা বাদামী মানুষটির গালে আলতো চুমু দেয় দেশের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটি। আর টানটান হয়ে মাইক্রোফোন তুলে নেন রহমান বিল্লাহ। খাঁটি ব্রিটিশ উচ্চারণে সবাইকে হাসিয়ে বলেন, "আজ ডিনারের সাথে আমার ছবি সহ ফোর্বস এর নয়া সংখ্যা ফ্রি!"

ডিসেম্বর ২০০৮

আহারে!

মানুষ আর শুয়োরের মধ্যে কি কোনো পার্থক্য আছে? আমরা শুয়োর খাই, মানুষ খাই না। আর কিছু?

হিমেলের ইচ্ছে করে ক্যাফের সব ছাত্র-ছাত্রীকে শুয়োরের শিরদাঁড়ার মতো চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে।

ওই যে সামনে খিলখিল করে হাসছে কিছু এশিয়ান ছেলেমেয়ে। কোন দেশী? কোরিয়ান সম্ভবত। এত হাসি কিসের শুয়োরের বাচ্চাগুলোর? ইচ্ছে করে প্রত্যেকের মাথা ধড় থেকে ছিড়ে নেই। চুলের মুঠি ধরে একটা হ্যাঁচকা টান। গলা ছিঁড়ে যাবে। ফোয়ারার মতো রক্ত ছিটাবে সারা ক্যাফে জুড়ে। আর ওই দিকে ওই কালোগুলো? প্রকান্ড দেহ জুড়ে বসে গর্দভগুলো। হাতির মতো নিনাদ করছে আর চেয়ার ধাপাচ্ছে। ক্যানো শুনি? চেয়ারগুলো কি তোর বাপের? প্রতিটা জিনিস স্কুলের পাওয়া ট্যুইশন থেকে কেনা। প্রতিটা চেয়ারে হিমেলেরও সমান ভাগ। ওই হারামজাদারা এভাবে ধাপাচ্ছে কেনো ওর চেয়ারগুলো? প্রত্যেকটার মাথা মেঝেতে ফেলে মাড়িয়ে পিষে দেয়া যায় না? টুকরো টুকরো করে দেয়া যায় না খুলি? সেই খুলির সাদা সাদা টুকরোর সাথে মিশে যাবে শুয়োরগুলোর হলুদ ঘিলু। লেপ্টে দেবে মেঝের সাথে। আর ওই সাদা ছেলে-মেয়েগুলো সাদা স্রাবের মতো বসে আছে। আরে মাতারীর বাচ্চারা, তোদেরকেও ছাড়বো না। তোদের পাট ছিবড়ে পাট-পাট করবো। ভেজা গামছা যেভাবে ঝাড়ে ঠিক সেভাবে তোদের মোচড়াবো। পটপট শব্দে হাড় ভাঙবে। ভাঙা হাড় বেরিয়ে আসবে এখানে সেখানে চামড়া ভেদ করে। গামলা গামলা রক্ত পড়বে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। আরব, ল্যাটিন আমেরিকান হারামীগুলোকে বানাবো কাবাব। কুত্তাগুলোকে কুচিকুচি কাটবো করাত দিয়ে। শুরু করবো পা দিয়ে। অল্প অল্প করে মাথার দিকে যাবো। দেখ শালারা ব্যাথা কাকে বলে! আর ওইদিকে ওই শালারা কি বাংলাদেশী নাকি? নাকি ইন্ডিয়ান? পাকি? তোদেরও রেহাই নাইরে। যেই দাঁত বের করে হাসছিস সেই দাঁতগুলো একটা একটা করে তুলে নেবো প্লায়ার্স দিয়ে। এরপর প্রতিটা নোখ চোখ কান। এরপর আঙ্গুল, এরপর হাত, এরপর...

নাকি আগুন ধরিয়ে দেবো এই ক্যাফেতে? এই স্কুলে? এই শহরে? এই দেশে? সারা পৃথিবীতে? তোদের আনন্দের শেষ আমি দেখবো। কুত্তার বাচ্চারা। শুয়োরের বাচ্চারা। হারামজাদার দল। জ্যান্ত পোড়াবো তোদেরকে। চামড়া খসে পড়বে। চর্বি গলে গলে পড়বে। পটপট করে পপকর্নের মতো ফাটবে তোদের সুখী মাংস। এক লাথিতে ভেঙে ফেলবো পুরো দালান। সব দালান। মুচড়ে ফেলবো সব গাড়ি। সব স্থাপত্য।

***

নাহ! তোরা সবাই ভালো রে। খারাপ এই আমি। আমিই খাবাপ। আর নষ্ট। আমি নিজেকেই ধ্বংস করবো। নিজেকেই জ্বালাবো। নিজেকেই কুচিকুচি করবো কেটে। এরপর...

“জনাব তাহলে এইখানে? লাইব্রেরিতে দেখা করার কথা ছিলো না?”

মরার মতো গ্যাবির দিকে তাকায় হিমেল। সোনালী চুল, আর সবুজ চোখ। তাই না? এই সব চুরমার হবে। আমিই সব চুরমার করবো। তোর চুল ছিঁড়ে নেবো। চোখ উপড়ে ফেলবো। তোর...

হিমেলকে দেখে কেমন ভয় পেয়ে যায় গ্যাবি। ওর গা ঘেঁষে বসে কেমন আকুলকা নিয়ে জিজ্ঞেস করে, "কী হয়েছে হিমেল?"

হিমেল হয়তো এই মমতার অপেক্ষাতেই ছিলো। কিংবা এই মমতাই ওর অপেক্ষায় ছিলো। পাজল বোর্ডের বিচ্ছিন্ন টুকরোর মতো হিমেলের চারপাশে খসে পড়তে থাকে ওর এতক্ষণের পৃথিবী। সব হিংসা বদলে কেমন ঝাপসা হয়ে যায়। হিমেল ফুঁপিয়ে উঠে বলে, "আজ আমার মা মারা গেছে।" গ্যাবি সঙ্গে সঙ্গে হিমেলকে জড়িয়ে ধরে।

***

ক্যাফেতে ওইদিন মোট সাতাশজন ছাত্র-ছাত্রী ছিলো। সেদিনের পর থেকে ওদের প্রত্যেকের মনে শ্যামলা একটা ছেলের চিৎকার করে কান্নার ছবি সারা জীবনের জন্য বাঁধা পড়ে যায়!

আগস্ট ২০০৮

যদি

ঘুম থেকে উঠেই একটা সিগারেট ধরায় কামাল।

আজকাল সিগারেট খেলে বুকে ব্যাথা করে। দম নেয়ার সাথে সাথে বুঝতে পারে গলায় কোথাও ধোঁয়া আটকে যাচ্ছে। প্রশ্বাসের সাথে জমে থাকা শ্লেমার খড়-খড়ানি স্পষ্ট অনুভব করা যায়। সস্তা সিগারেটে টানের সাথে সাথে মনে হয় – যদি কেউ থাকতো কাছে এখন! অভিমান নিয়ে কেউ যদি বলতো, "আর না, অনেক হয়েছে! আর একটা সিগারেটও ধরাতে পারবে না!"

ঘড়ি দেখে কামাল – ভোর সাড়ে চারটা। সাড়ে পাঁচটার সময় বিস্কুটের কারখানায় কামলা খাটতে যেতে হয়। মা' কে একটা গ্রামীনের ফোন কিনে দিয়েছে বড় খালুর মাধ্যমে। সেই মোবাইলের নাম্বার টেপে নিজের ক্ষয়ে আসা কিপ্যাড থেকে। মা বুড়ো হয়ে গেছেন। এখন বাবার কাছে পৌঁছুনোর অপেক্ষা।

"মা আমি ভালো আছি। বউ ভালো আছে। নাতির মুখ দেখবে মা। আমার প্রমোশনটা হোক। হবে মা। এই বছরের শেষেই হবে। টাকা পাঠাতে হবে মামাকে? বোনকে? পাঠাবো!"

ফোন রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামাল। বিয়ে করেছিলো পাসপোর্ট পারার আশায়। মা সেটা জানেন না; ভেবে বসেছেন এখানে সুখের সংসার সাজিয়েছে সে। বোনটা বিয়ে করে সেই পার্বত্য চট্রগ্রাম। যোগাযোগ বলতে গেলে কেবল টাকা পাঠানোর ফর্ম।

বাংলাদেশের একটা ডিগ্রী ছিলো ওর। নাকি ছিলো না? এখন ঠিক মনেও পড়ে না। আহারে কী কষ্টের জীবন। ভোর থেকে রাত দশটা পর্যন্ত হাড় ভাঙা খাটুনি। একটু কষ্ট করে একটা ডিপ্লোমা করে ফেললে ভালো একটা চাকরি পাওয়া যেতো না? কেন যাবে না? কিন্তু কার জন্য? যদি কেউ থাকত, যদি কেউ বলতো ঠোঁট ফুলিয়ে, "তোমার এত কষ্ট আমার ভাল্লাগে না। কান্না পায়। ভালো একটা চাকরী খুঁজে নাও লক্ষিটি!"

সময় বাঁধা বাস বাসস্টপে সময় ধরেই চলে আসে।

কাজে কথা কমই বলে ও। লরি থেকে মাল নামতে-ওঠাতে কথা বলার সুযোগও নেই। আর এতদিন বিদেশে থেকেও ওর ইংরেজীটা রপ্ত হলো না। কাজ শেষে পাঞ্চ মেশিনে নিজের কার্ড পাঞ্চ করে বেরিয়ে আসে ও।

নির্ভরযোগ্য বাস ঘড়ি ধরেই ওকে তুলে নেয়।

আসার পথে ভিক্টোরিয়া পার্কে নামে। কিছু বাজার দরকার।

বাজার শেষে বাঙালি রেস্তোরায় ঢুকে খিচুরি-মাংসে হাত মাখায় কামাল। ভালো কিছু রান্না করা হয় না বাসায়; ইচ্ছে হয় না। একা নিজের জন্য রান্না করার কোনো মানে নেই। স্বপ্নে একটা মেয়েকে দেখে ও। ওর আসার সময় দাঁড়িয়ে থাকে গেটের সামনে। সারাটা দিন ওর পছন্দের পদ রান্না করে লক্ষী মেয়ে।

আহা! যদি সেই মমতার ছিটেমাত্র থাকত এই রেস্তোরার খিচুড়িতে।

পাশের টেবিলে আড্ডায় কেউ চড়া গলায় বলে, “মানুষ এখানে আসে ইমিগ্রেশনের ধান্দায়, আবাল! পড়তে আসছিস, আগে পড়া শেষ কর। তার আগেই কারখানায় কাজ!”

কথাটা কে বলছে মুখ ফিরিয়ে দেখে কামাল। ছেলেটাকে চেনে ও – অমিত আহমেদ। আগে কোথাও পরিচয় হয়েছিলো। কষ্টের হাসি হাসে কামাল। হায়রে, সারা জীবন প্রাচুর্যে থেকে তুই কী বুঝবি মানুষের বাধ্যকতা?

কাছেই বাসা। এক হাতে বাজারের ব্যাগ ধরে পা টেনে টেনে সেদিকেই হাঁটে কামাল। বাঙালি এলাকার বাঙালি কথা। ধার্মিক মানুষ রাস্তার পাশের উদ্দামতা দেখে সন্তানের হাত আরও শক্ত করে ধরে বলেন, “আসতাগফিরুল্লাহ!” হায়রে একটা হাত ধরার ক্ষমতাও তো তোমার খোদা আমাকে দেয়নি... যদি দিতো!

চাবি ঘুরিয়ে নিজের অন্ধকার বেসমেন্টে ঢুকে পড়ে কামাল। মুখে পানি দিয়ে বিছানায় উঠে পড়ে। রাত প্রায় একটা বেজে গেছে। কাল আবার সকালে কাজ। বালিশে মাথা রাখতেই ঘুমে জড়িয়ে আসে চোখ। মাগো, ছোট্ট বোন আমার... চোখ ভেঙে আসে ক্লান্তি; আসে নিঃসঙ্গতা; আর স্বপ্ন; যদি...

মে ২০০৭

ফ্যান্টাসি

আদিলের জন্য আমরা আমাদের জান কুরবান করে দিলাম! আদিল আমাদের বন্ধু – তার মুখে হাসি ফোটানো আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। তাই যতো প্রকারে সম্ভব আদিলের সাথে সোমার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবার অদম্য চেষ্টা চলতে থাকলো।

ডিপার্টমেন্টের সেরা ছাত্র রুবেল। ওর কাছে সোমা যখন নোট চাইলো রুবেল মাথা চুলকে বললো, "ইয়ে! নোট তো আদিলের কাছে। ওর কাছ থেকে নিয়ে নিও?" এবং ওই দিনই রুবেল তার নোট আদিলকে দিয়ে দিলো।

আমার আবার একটু, মানে কবিতা লেখার অভ্যেস আছে। তাই আমার কাছে সোমা যখন তার বান্ধবীর লিটলম্যাগের জন্য কবিতা চাইলো, আমি বললাম, "আমি? কবিতা? অবশ্যই দেবো! তবে আদিল খুব চমৎকার একটা কবিতা লিখেছে দেখলাম। দেখো ওটা হাতাতে পারো কিনা... এমন কবিতা যে তোমাদের পত্রিকায় আগে আর আসেনি সে বিষয়ে আমি ড্যাম শিওর!" আমি সেদিন বিকেলেই আদিলকে আমার লেখা শ্রেষ্ঠ কবিতাটা দান করে দিলাম।

এ ধরণের ছোট-খাট কুরবানি (আমার কথা আলাদা, অন্যদের কথা বলছি) মিলে ব্যাপার অনেক বড় হয়ে দাঁড়ালো। এক সময় আমরা নিশ্চিত হলাম – কাজ হয়েছে। অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। সোমা অবশেষে গলেছে।

তবে ভালোবাসা দিবসে শেষ চমকটা দিলো আদিলই। মিল্টনের কাছ থেকে ঘটনা শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গেলো আমার। ফুঁসতে ফুঁসতে খুঁজে বের করলাম শালাকে। হারামজাদা দেখি একা একা ক্যান্টিনে বসে চায়ে ভিজিয়ে বিস্কুট খাচ্ছে।

সামনে দাঁড়িয়ে না বসেই দড়াম করে টেবিলে ঘুষি মারলাম আমি (সেই সাথে আদিলের চায়ে ডোবানো বিস্কুটটা ভেঙে পড়ে গেলো কাপের তলায়)। চমকে আমার দিকে তাকালো আদিল। আবার ঘুষি মারলাম টেবিলে (এবার বেশিই হয়ে গিয়েছিলো – চা সহ উলটে পড়ে গেলো কাপ)।

দাবি করলাম আমি, "বল, ঘটনা যা শুনলাম তা সত্যি নয়!"

"ওহ্..." হাঁফ ছেড়ে বাঁচে যেনো শালা। বলে, "এই তাহলে ব্যাপার? হ্যাঁ সত্যি! "

"সত্যি? তার মানে তুই বলতে চাস যে মেয়ের মন জয়ের জন্য আমি আমার শ্রেষ্ঠ কবিতাটা তোকে দান করে দিয়েছি... সেই মেয়ে যখন তোকে ভালোবাসা দিবসে প্রেম নিবেদন করেছে তখন তুই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিস; এই কথা সত্যি?"

"একশো ভাগ।" মধুর হাসে আদিল।

"কিন্তু কেনো?" ষাড়ের মতো চেঁচিয়ে আবার দড়াম ঘুষি মারলাম টেবিলে (ঘুষিটা পড়লো গড়িয়ে পড়া চায়ের ওপর; ফলে চা ছিটকে গেলো আদিলের দিকে; সরে গিয়ে শার্ট বাঁচালো হারামজাদা)।

"তুই লেখালেখি করিস। ফ্যান্টাসি আর ফিকশনের মধ্যে পার্থক্য বুঝিস?" হঠাৎ শুধায় আদিল।

"কেনো? এখানে সে কথা আসছে কিভাবে?" কথাটা হয়তো বেশি জোরেই বলে ফেলেছিলাম। ফলে মুখ থেকে থুতু ছেটালো আমার।

"ফিকশন হলো বাস্তব কল্পনা – যা সম্ভব। আর ফ্যান্টাসি হলো অবাস্তব কল্পনা – অসম্ভব।" আমার প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে রুমাল বের করে মুখ মুছলো আদিল। আসলে সবটাই ভান। এতটা থুতু ছিটাইনি আমি যে রুমাল বের করতে হবে।

"শোন সাব্বির। সোমা ধনী – আমি ছাপোষা মধ্যবিত্তের সন্তান। সোমা মেধাবী – আমি টেনেটুনে কোনো রকম পাস করে যাচ্ছি। সোমা সুন্দরী – আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছিস। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো সোমা ভয়ানক অহঙ্কারী। এমন মেয়ে আমাকে পছন্দ করবে এমন কখনো ভেবেছিলি? বলতো বুকে হাত দিয়ে?"

"ইয়ে, মানে ওভাবে তো... না!" অবশেষে বলতে বাধ্য হলাম।

"তাহলেই দেখ! অনেকে জনপ্রিয় চিত্রনায়িকাকে প্রেমিকা কল্পনা করে, অনেকে কোনো মডেলকে, এটা তাদের ফ্যান্টাসি। ভালো মতোই জানে ওদের এই কল্পনা সত্যি হবে না কখনোই। তেমনি সোমা ছিলো আমার ফ্যান্টাসি। ওকে নিয়ে ভেবেছি। কল্পনা করেছি। তবে ভালোবাসা বলতে যা বোঝায় তা কখনোই বাসিনি আমি। তাই ফিরিয়ে দিতে হলো। স্যরি দোস্ত! আমি জানি তোরা কতোটা করেছিস আমার জন্য। তোদের সব খাটুনি আমার জন্যই বৃথা গেলো।"

"তাহলে কী হবে এখন?" একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ধপাস করে বসে পড়লাম আমি। আদিলের কথায় যুক্তি আছে। তাই গলার তেজ কমে যায়, রাগের জায়গায় ভর করে হতাশা।

"সোমার কিছুই হবে না। সে রানী। আর রানীদের আর যাই হোক রাজার অভাব কখনোই হয় না। তবে সমস্যা হবে আমার। এখন নতুন করে কাকে কল্পনার দেবী বানাই বল তো?"

"আরে স্টুপিড, তোদের কী হবে তা জানতে চাইছি না!" প্রচন্ড বিরক্তি নিয়ে বললাম আমি, "আমার শ্রেষ্ঠ কবিতাটা যে পত্রিকায় তোর নামে ছাপা হয়ে গেছে সেটার কী হবে জানতে চাইছি!"

ফেব্রুয়ারি ২০০০

বিভ্রাট

"রাতের জন্য বিশেষ কোনো পরিকল্পনা আছে?" গ্লাসের তলে জমে থাকা হুইস্কিটুকু একটানে শেষ করে জিজ্ঞেস করেন ভদ্রলোক।

"জ্বী না।"

"তাহলে আর এখানে বসে কী করবেন? চলেন আমার রুমে। সব ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছে। এখন তার সেলিব্রেশন করা যাক।"

দ্বিমত করার কারণ দেখিনা। হোটেল বারে বেশ ভালোই গেলা হয়ে গেছে। কাল দুপুরে ফ্লাইট। এখন এমনিতেও নিজের রুমে গিয়ে টিভি দেখতাম। ভদ্রলোক বেশ আমুদে মনে হচ্ছে। তার সাথেই না হয় আড্ডা জমানো যাক।

"তা কিছু অর্ডার করলে কেমন হয় বলেন তো?" চোখ টিপে শুধান ভদ্রলোক।

সত্যি কথা বলতে কী আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম। দু'ফোটা গিললেই ক্ষুধায় পেট কিড়মিড় করে আমার। তাই বলি, "অতি উত্তম প্রস্তাব! তবে লোকাল কিছু অর্ডার করতে চাচ্ছি না।"

"আপনার কোনো সাজেশন?"

"ইটালিয়ান?"

"মন্দ হয় না... তবে ক্যারিবিয়ান আপনার কেমন লাগে?"

"চলনসই, তবে মেক্সিকান ভালো লাগে তার চেয়েও বেশি।"

"মেক্সিকান আসলে আমার ঠিক রোচে না। চাইনিজে কোনো আপত্তি আছে?"

"মোটেই না। আজ রাতে চাইনিজ-ই হোক," রাজি হয়ে যাই। ফ্রাইড রাইস, সুইট অ্যান্ড সাওয়ার চিকেন বল আর চাওমিনের কল্পনায় লোল জমে মুখে।

"তা সাথে কনডম আছে তো?"

মুখ হা হয়ে যায় আমার, "কনডম! কেনো? কনডম কেনো?"

"এসব চাইনিজ পতিতাদের সাথে কনডম ছাড়া সঙ্গমে যাবেন? পাগল নাকি? আলবাৎ না!"

আমি ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকি।

মার্চ ২০০৮

একটি সীমাহীন সংলাপ প্রকাশনা

অমিত আহমেদ

ফেলে আসা গল্প যতো

জানুয়ারি ২০০৯

বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

লেখকের অন্য বই

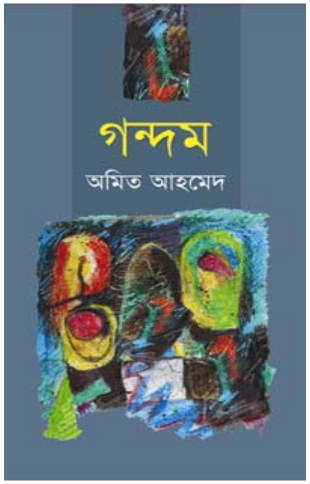

গন্দম (উপন্যাস)
অমিত আহমেদ
প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি ২০০৮, জাগৃতি প্রকাশন
প্রচ্ছদশিল্পী: ইসমাইল গনি হিমন
ISBN: 984-700-870042-3
১২৭ পৃষ্ঠা, মূল্য: ১৩৫ টাকা
ই-শপিং: বইমেলা, গ্রন্থমেলা

এছাড়াও দেশের সম্ভ্রান্ত বইঘরে পাওয়া যাচ্ছে

প্রকাশিতব্য বই

বৃষ্টিদিন রৌদ্রসময় (গল্পগ্রন্থ)
প্রকাশিত হবে একুশে বইমেলা ২০০৯ শস্যপর্ব প্রকাশন থেকে
বইমেলায় পাওয়া যাবে লিটল ম্যাগ কর্নারে